

বনলতা সেন

জীবনানন্দ দাশ

BANGLADARSHAN.COM

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল-সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয়-সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিহিসার-অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরও দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন ?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

কুড়ি বছর পরে

আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি।

আবার বছর কুড়ি পরে—

হয়তো ধানের ছড়ার পাশে

কার্তিকের মাসে—

তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে—তখন হলুদ নদী

নরম-নরম হয় শর কাশ হোগলায়—মাঠের ভিতরে।

অথবা নাইকো ধান ক্ষেতে আর ;

ব্যস্ততা নাইকো আর,

হাঁসের নীড়ের থেকে খড়

পাখির নীড়ের থেকে খড়

ছড়াতেছে ; মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল।

জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার—

তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার।

হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝরাতে একরাশ পাতার পিছনে

সরু-সরু কালো-কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,

শিরীষের অথবা জামের,

ঝাউয়ের—আমের ;

কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে।

জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার—

তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার-আমার !

তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পৈঁচা নামে—

বাবলার গলির অন্ধকারে

অশথের জানালার ফাঁকে

কোথায় লুকায় আপনাকে।

চোখের পাতার মতো নেমে চুপি কোথায় চিলের ডানা থামে—

সোনালি-সোনালি চিল-শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে-
কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে।

পৌষ ১৩৪২

BANGLADARSHAN.COM

হাওয়ার রাত

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল-অসংখ্য নক্ষত্রের রাত ;
সারারাত বিস্তীর্ণ হাওয়া আমার মশারিতে খেলেছে ;
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনও মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো,
কখনও বিছানা ছিঁড়ে

নক্ষত্রের দিকে উড়ে যেতে চেয়েছে ;

এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার-আধো-ঘুমের ভিতর হয়তো-

মাথার উপরে মশারি নেই আমার,

স্বাভী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো, উড়ছে সে !
কাল এমন চমৎকার রাত ছিল।

সমস্ত মৃত নক্ষত্রেরা কাল জেগে উঠেছিল-আকাশে এক তিল ফাঁক ছিল না ;
পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি ;
অন্ধকার রাতে অশ্বখের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো
ঝলমল করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা ;

জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ !

কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিল।

যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার-হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে ;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায়-কুয়াশায় দীর্ঘ বর্ষা হাতে করে
কাতারে-কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন-

মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য ?

জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য ?

প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য ?

আড়ষ্ট-অভিভূত হয়ে গেছি আমি,

কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন ;

আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর

পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল !

আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে শাঁই-শাঁই করে,
সিংহের হুক্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো।
হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেলেটর সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায় !

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে,
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায়-তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল
একটা দুরন্ত শকুনের মতো।

চৈত্র ১৩৪২

BANGLADARSHAN.COM

আমি যদি হতাম

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি,
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে ;

তাহলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে
ঝাউয়ের শাখার পেছনে চাঁদ উঠতে দেখে
আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে
আকাশের রূপালি শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম—
তোমার পাখনায় আমার পালক, আমার পাখায় তোমার রক্তের স্পন্দন—
নীল আকাশে খইক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা,
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ।

হয়তো গুলির শব্দ :
আমাদের তির্যক গতিস্রোত,
আমাদের পাখায় পিস্টনের উল্লাস,
আমাদের কণ্ঠে উত্তর হাওয়ায় গান !

হয়তো গুলির শব্দ আবার :
আমাদের স্তব্ধতা,
আমাদের শান্তি।

আজকের জীবনের এই টুকরো-টুকরো মৃত্যু আর থাকত না ;
থাকতনা আজকের জীবনের এই টুকরো-টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার ;
আমি যদি বনহংস হতাম ;
বনহংসী হতে যদি তুমি ;
কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে।

ঘাস

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস-তেমনি সুঘ্রাণ-
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
আমারও ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে-গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি-চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

পৌষ ১৩৪২

BANGLADARSHAN.COM

হায় চিল

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে।
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আন ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে
ভালোবাসে !

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদোনাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

চৈত্র ১৩৪২

BANGLADARSHAN.COM

বুনো হাঁস

পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে—

জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে

বুনো হাঁস পাখা মেলে—শাঁই-শাঁই শব্দ শুনি তার ;

এক—দুই—তিন—চার—অজস্র—অপার—

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্ত ডানা ঝাড়া

এঞ্জিনের মতো শব্দে ; ছুটিতেছে—ছুটিতেছে তারা।

তারপর পড়ে থাকে নক্ষত্রের বিশাল আকাশ,

হাঁসের গায়ের ঘ্রাণ—দু—একটা কল্পনার হাঁস ;

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরণিমা সান্যালের মুখ ;

উডুক-উডুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উডুক

কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর

উডুক-উডুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

BANGLADARSHAN.COM

শঙ্খমালা

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,
বলিল, তোমারে চাই :
বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখনায়—

সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
জোনাকির দেহ হতে—খুঁজেছি তোমারে সেইখানে—
ধূসর পৈঁচার মতো ডানা মেলে অম্বানের অন্ধকারে
ধানসিড়ি বেয়ে-বেয়ে
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পৈঁচার মতো প্রাণে।

দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা ;
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।

কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম ;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হয়।

চোখে তার
যেন শত-শতাব্দীর নীল অন্ধকার !
স্তন তার
করণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার !
এ-পৃথিবী একবার পায় তারে, পায়নাকো আর।

নগ্ন নির্জন হাত

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠছে :

আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো এই অন্ধকার।

যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে

অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখিনি,

সেই নারীর মতো

ফাল্গুন আকাশে অন্ধকার নিবিড় হয়ে উঠছে।

মনে হয় কোন্ বিলুপ্ত নগরীর কথা

সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।

ভারতসমুদ্রের তীরে

কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে

অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে

আজ নেই, কোনো এক নগরী ছিল একদিন,

কোন্ এক প্রাসাদ ছিল ;

মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদ :

পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল,

আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাজক্ষা,

আর তুমি নারী—

এইসব ছিল সেই জগতে একদিন।

অনেক কমলারঙের রোদ ছিল

অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল,

মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক ;

অনেক কমলরঙের রোদ ছিল,

অনেক কমলারঙের রোদ ;

আর তুমি ছিলে ;

তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না,

খুঁজি না।

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায়-পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরও দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।
পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ !
তোমার নগ্ন নির্জন হাত ;
তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

আশ্বিন ১৩৪৩

BANGLADARSHAN.COM

শিকার

ভোর ;

আকাশের রঙ ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল :

চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।

একটি তারা এখনো আকাশে রয়েছে :

পাড়াগাঁর বাসরঘরে সবচেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো ;

কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা

আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিল

হাজার-হাজার বছর আগে এক রাতে তেমনি—

তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও।

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্যে দেশোয়ালীরা

সারারাত মাঠে আগুন জ্বলেছে—

মোরগফুলের মতো লাল আগুন :-

শুকনো অশ্বখপাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের ;

সূর্যের আলোয় তার রঙ কুস্কুমের মতো নেই আর ;

হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।

সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারদিকের বন ও আকাশ

ময়ূরের সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

ভোর ;

সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে

নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে-ঘুরে

সুন্দর বাদামি হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল !

এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে ;

কচি বাতাবিলেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছে ;

নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল—

ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো একটা আবেগ দেওয়ার জন্য

অন্ধকারের হিম কুণ্ডিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো

একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য ;

এই নীল আকাশের নিয়ে সূর্যের সোনার বর্ষার মতো জেগে উঠে

সাহসে সাথে সৌন্দর্যে হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

একটা অদ্ভুত শব্দ।

নদী জল মচকাফুলের পঁপড়ির মতো লাল।

আগুন জ্বলল আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এল।

নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় বসে অনেক পুরানো শিশিরভেজা গল্প ;

সিগারেটের ধোঁয়া ;

টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা ;

এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

আশ্বিন ১৩৪৩

BANGLADARSHAN.COM

হরিণেরা

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি-ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে

হরিণেরা ; রূপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায় ;
বাতাস ঝাড়িছে ডানা-মুক্তা ঝরে যায়

পল্লবের ফাঁকে-ফাঁকে-বনে-বনে-হরিণের চোখে ;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।

হীরের প্রদীপ জ্বলে শেফালিকা বোস যেন হাসে
ছিজল ডালের পিছে অগণন বনের আকাশে,-

বিলুপ্ত ধূসর কোন্ পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

বাতাস ঝাড়িছে ডানা, হীরা ঝরে হরিণের চোখে-
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর হীরার আলোকে।

BANGLADARSHAN.COM

বেড়াল

সারাদিন একটা বেড়ালের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে কেবলই আমার দেখা হয় :
গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামি পাতার ভিড়ে ;
কোথায় কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর
তারপর শাদা মাটির কঙ্কালের ভিতর
নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে দেখি ;
কিন্তু তবুও তারপর কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়াচ্ছে,
সারাদিন সূর্যের পিছনে-পিছনে চলছে সে।
একবার তাকে দেখা যায়,
একবার হারিয়ে যায় কোথায়।
হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
তারপর অন্ধকারকে ছোটো-ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনল সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল।

সুদর্শনা

একদিন ম্লান হেসে আমি
তোমার মতন এক মহিলার কাছে
যুগের সঞ্চিত পণ্যে লীন হতে গিয়ে
অগ্নিপরিধির মাঝে সহসা দাঁড়িয়ে
শুনেছি কিন্নরকণ্ঠ দেবদারু গাছে,
দেখেছি অমৃতসূর্য আছে।

সবচেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি ভালো ;
তবুও সময় স্থির নয় ;
আরেক গভীরতর শেষ রূপ চেয়ে
দেখেছে সে তোমার বলয়।

এই পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন
তোমার শরীর ; তুমি দান করোনি তো ;
সময় তোমাকে সব দান করে মৃতদার বলে
সুদর্শনা, তুমি আজ মৃত।

অন্ধকার

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছল-ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার ;

তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া

গুটিয়ে নিয়েছে যেন

কীর্তিনাশার দিকে।

ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পউষের রাতে—

কোনোদিন আর জাগব না জেনে

কোনোদিন জাগব না আমি—কোনোদিন জাগব না আর—

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,

তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,

হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে

রয়েছে যে অগাধ ঘুম

সে আশ্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই,

তুমি প্রদাহ প্রবহমান যন্ত্রণা নও—

জানো না কি চাঁদ,

নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,

জানো না কি নিশীথ,

আমি অনেক দিন—

অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে

হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে

বুঝতে পেরেছি আবার ;

ভয় পেয়েছি,

পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা ;

মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য

আমাকে নির্দেশ দিয়েছে ;

আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে ;

সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি-কোটি শুয়োরের আর্তনাদে

উৎসব শুরু করেছে

হায়, উৎসব !

হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে

আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।

কোনোদিন মানুষ ছিলাম না আমি।
হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনোদিন ;
আমি অন্য কোনো নক্ষত্রের জীব নই।
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রহি,
শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর ;
এইসব ভয়াবহ আরতি !
গভীর অন্ধকারের ঘুমের আঙ্গাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও ?
হে সময়গ্রহি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম হাওয়া
আমাকে জাগাতে চাও কেন।
অরব অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর ছল-ছল শব্দে জেগে উঠব না আর ;
তাকিয়ে দেখব না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে।
ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব-ধীরে-পউষের রাতে-
কোনোদিন জাগব না জেনে-
কোনোদিন জাগব না আমি-কোনোদিন আর।

কমলালেবু

একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে ?
আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

পৌষ ১৩৪৪

BANGLADARSHAN.COM

শ্যামলী

শ্যামলী, তোমার মুখ সেকালের শক্তির মতন ;
যখন জাহাজে চড়ে যুবকের দল
সুদূর নতুন দেশে সোনা আছে বলে,
মহিলারই প্রতিভায় সে ধাতু উজ্জ্বল
টের পেয়ে, দ্রাক্ষা দুধ ময়ূরশয্যায় কথা ভুলে
সকালের রুঢ় রৌদ্রে ডুবে যেত কোথায় অকূলে।

তোমার মুখের দিকে তাকালে এখনও
আমি সেই পৃথিবীর সমুদ্রের নীল,
দুপুরের শূন্য সব বন্দরের ব্যথা,
বিকেলের উপকণ্ঠে সাগরের চিল,
নক্ষত্র, রাত্রির জল, যুবাদের ক্রন্দন সব—
শ্যামলী, করেছি অনুভব।

অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল ;
মানুষকে স্থির-স্থিরতর হতে দেবে না সময় ;
সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত-নদী।
অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয়
দূর সাগরের শব্দ-শতাব্দীর তীরে এসে ঝরে ;
কাল কিছু হয়েছিল ;—হবে কি শাস্বতকাল পরে।

দুজন

‘আমাকে খোঁজো না তুমি বহুদিন–কতদিন আমিও তোমাকে
খুঁজিনাকো ;–এক নক্ষত্রের নিচে তবু–একই আলো পৃথিবীর পারে
আমরা দুজনে আছি ; পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয় ;
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয় ;
হয় নাকি ?’–বলে সে তাকাল তার সঙ্গিনীর দিকে ;
আজ এই মাঠ সূর্য সহধর্মী অস্থান-কার্তিকে
প্রাণ তার ভরে গেছে।

দুজনে আজকে তারা চিরস্থায়ী পৃথিবী ও আকাশের পাশে
আবার প্রথম এল–মনে হয়–যেন কিছু চেয়ে–কিছু একান্ত বিশ্বাসে।
লালচে হলদে পাতা অনুষ্ণে জাম বট অশথের শাখার ভিতরে
অন্ধকারে নড়ে-চড়ে ঘাসের উপর ঝরে পড়ে ;
তারপর সান্ত্বনার থাকে চিরকাল

যেখানে আকাশে খুব নীরবতা, শান্তি খুব আছে,
হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে-ক্রমে যেখানে মানুষ
আশ্বাস খুঁজেছে এসে সময়ের দায়ভাগী নক্ষত্রের কাছে ;
সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন ; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে ;–চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি ;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে–শালিকের নেই আর দেরি,
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমাবে সে শিশিরের জলে ;
ঝরিছে মরিছে সব এইখানে–বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের ফলে।

নারী তার সঙ্গীকে : ‘পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি ;–তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কী নিয়ে থাকিবে বল ;–একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা,
তারপর ঝরে গেছে ; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের–প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরত না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে–’

এই বলে ত্রিয়মাণ আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়ায়ে রহিল হাঁটুভর।
হলুদরঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অস্থানের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে-ছেন যেতেছে শরীর ;
চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির ;—

প্রেমিকের মনে হল : ‘এই নারী-অপরূপ-খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে ;
যেখানে রব না আমি, রবে না মাধুরী এই, রবে না হতাশা,
কুয়াশা রবে না আর-জনিত বাসনা নিজে-বাসনার মতো ভালোবাসা
খুঁজে নেবে অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতেরে তার।’

বৈশাখ ১৩৫৭

BANGLADARSHAN.COM

অবশেষে

এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু-উঁচু গাছ।
সবুজ পাতার 'পরে যখন নেমেছে এসে দুপুরের সূর্যের আঁচ
নদীতে স্মরণ করে একবার পৃথিবীর হরিণের মতো শান্ত থাকে
এই সব গাছগুলো ; -যেন কোনো দূর থেকে অস্পষ্ট বাতাস
বাঘের ঘ্রাণের মতো হৃদয়ে জাগিয়ে যায় ত্রাস ;
চেয়ে দেখ-ইহাদের পরস্পর নীলিম বিন্যাস
নড়ে ওঠে দ্রুততায় ; -আধো নীল আকাশের বুক
হরিণের মতো দ্রুত ঠ্যাঙের তুরকে
অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে তারা বটে ;
একজোটে কাজ করে মানুষেরা যে রকম ভোটের ব্যালটে ;
তবুও বাঘিনী হয়ে বাতাসকে আলিঙ্গন করে-
সাগরের বালি আর রাত্রির নক্ষত্রের তরে।

স্বপ্নের ধ্বনিরা

স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে বলে যায় : স্থবিরতা সবচেয়ে ভালো ;
নিস্তর শীতের রাতে দীপ জ্বলে
অথবা নিভায়ে দীপ বিছানায় শুয়ে
স্থবিরের চোখে যেন জমে ওঠে অন্য কোন্ বিকেলের আলো
সেই আলো চিরদিন হয়ে থাকে স্থির ;
সব ছেড়ে একদিন আমিও স্থবির
হয়ে যাব ; সেদিন শীতের রাতে সোনালি জরির কাজ ফেলে
প্রদীপ নিভায়ে রবো বিছানায় শুয়ে ;
অন্ধকারে ঠেস দিয়ে জেগে রবো
বাদুড়ের আঁকাবাঁকা আকাশের মতো।
স্থবিরতা, করে তুমি আসিবে বল তো।

পৌষ ১৩৪৪

BANGLADARSHAN.COM

আমাকে তুমি

আমাকে

তুমি দেখিয়েছিলে একদিন :

মস্ত বড়ো ময়দান-দেবদারু পামের মাথা-মাইলের পর মাইল

দুপুরবেলার জনবিরল গভীর বাতাস

দূর শূন্যে চিলের পাটকিলে ডানার ভিতর অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যায় ;

জোয়ারের মতো ফিরে আসে আবার ;

জানালায়-জানালায় অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে :

পৃথিবীকে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়।

তারপর

দূরে

অনেক দূরে

খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে-গান গায়-গান গায়-

এই দুপুরের বাতাস।

এক-একটা দুপুরে এক-একটা পরিপূর্ণ জীবন অতিবাহিত হয়ে যায় যেন।

বিকেলে নরম মুহূর্ত ;

নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীলগাই, হরিণের ছায়ার আসা-যাওয়া ;

একটা ধবল চিতল-হরিণীর ছায়া

আতার ধূসর ক্ষীরে-গড়া মূর্তির মতো

নদীর জলে

সমস্ত বিকেলবেলা ধরে

স্থির !

মাঝে-মাঝে অনেক দূর থেকে শ্মশানের চন্দনকাঠের চিতার গন্ধ,

আগুনের-ঘিয়ের ঘ্রাণ ;

বিকেলে

অসম্ভব বিষণ্ণতা।

ঝাউ হরীতকী শাল, নিভন্ত সূর্যে

পিয়াশাল পিয়াল আমলকী দেবদারু—

বাতাসের বুকে স্পৃহা, উৎসাহ, জীবনের ফেনা ;

শাদা শাদাছিট কালো পায়রার ওড়াউড়ি জ্যোৎস্নায়—ছায়ায়,

রাত্রি ;

নক্ষত্র ও নক্ষত্রের

অতীত নিস্করতা।

মরণের পরপারে বড়ো অন্ধকার

এইসব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো।

BANGLADARSHAN.COM

তুমি

নক্ষত্রের চলাফেরা ইশারায় চারিদিকে উজ্জ্বল আকাশ ;
বাতাসে নীলাভ হয়ে আসে যেন প্রান্তরের ঘাস ;
কাঁচপোকা ঘুমিয়েছে-গঙ্গাফড়িং সে-ও ঘুমে ;
আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছ তুমি।

মাটির অনেক নিচে চলে গেছ ?

তুমি আজ ? কোন্ কথা ভাবছ আঁধারে ?

ঐ যে ওখানে পায়রা একা ডাকে জামিরের বনে ;

মনে হয় তুমি যেন ঐ পাখি-তুমি ছাড়া সময়ের এ উদ্ভাবনে

আমার এমন কাছে-আশ্বিনের এত বড় অকূল আকাশে

আর কাকে পাব এই সহজ গভীর অনায়াসে-

বলতেই নিখিলের অন্ধকার দরকারে পাখি গেল উড়ে

প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে-প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।

ধান কাটা হয়ে গেছে

ধান কাটা হয়ে গেছে কবে যেন-ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়

পাতা কুটো ভাঙা ডিম-সাপের খোলস নীড় শীত।

এইসব উৎরায়ে ঐখানে মাঠের ভিতর

ঘুমাতেছে কয়েকটা পরিচিত লোক আজ-কেমন নিবিড়।

ঐখানে একজন শুয়ে আছে-দিনরাত দেখা হত কত-কত দিন,

হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কত অপরাধ ;

শান্তি তবু : গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং

আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।

আশ্বিন ১৩৫৮

BANGLADARSHAN.COM

শিরীষের ডালপালা

শিরীষের ডালপালা লেগে আছে বিকেলের মেঘে,
পিপুলের ভরা বুকে চিল নেমে এসেছে এখন ;
বিকেলের শিশুসূর্যকে ঘিরে মায়ের আবেগে
করণ হয়েছে ঝাউবন।

নদীর উজ্জ্বল জল কোরালের মতো কলরবে
ভেসে নারকোলবনে কেড়ে নেয় কোরালীর জ্বর্ণ ;
বিকেল বলেছে এই নদীটিকে : ‘শান্ত হতে হবে—’
অকূল শুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ

হয়ে আছে। তার মুখ মনে পড়ে এ-রকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর
পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে ; চারিদিকে রাত্রি-নক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো ; তবুও দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হয়ে থেকে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।

হাজার বছর শুধু খেলা করে

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো ;

চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান ;

বালির উপরে জ্যোৎস্না-দেবদারু-ছায়া ইতস্তত

বিচূর্ণ থামের মতো : দ্বারকার ;-দাঁড়িয়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।

শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের-ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন ;

‘মনে আছে ?’ শুধাল সে-শুধালাম আমি শুধু, ‘বনলতা সেন ?’

আশ্বিন ১৩৪৩

BANGLADARSHAN.COM

সুরঞ্জনা

সুরঞ্জনা, আজও তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছ ;
পৃথিবীর বয়সিনী তুমি এক মেয়ের মতন ;
কালো চোখ মেলে ঐ নীলিমা দেখেছ ;
গ্রীক-হিন্দু-ফিনিশিয় নিয়মের রূঢ় আয়োজন
শুনেছ ফেনিল শব্দে তিলোত্তমা-নগরীর গায়ে
কী চেয়েছে ? কী পেয়েছে ?-গিয়েছে হারিয়ে।

বয়স বেড়েছে ঢের নরনারীদের ;
ঈষৎ নিভেছে সূর্য নক্ষত্রের আলো ;
তবুও সমুদ্র নীল ; ঝিনুকের গায়ে আলপনা ;
একটি পাখির গান কী রকম ভালো।
মানুষ কাউকে চায়-তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল।

মনে পড়ে কবে এক তারাভরা রাতের বাতাসে
ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে
উতরোল বড়ো সাগরের পথে অস্তিম আকাজক্ষা নিয়ে প্রাণে
তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সজ্ঞ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরও আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লাস্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে ;-
তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।

মিতভাষণ

তোমার সৌন্দর্য নারি, অতীতের দানের মতন।
মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে
ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো
আমাদের নিয়ে যাক ডেকে
শান্তির সঙ্ঘের দিকে-ধর্মে-নির্বাণে ;
তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।

অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছ শ্রেয়তর বেলাভূমি :
যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে
তার স্নিগ্ধ মালতী-সৌরভে।

মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে ;
বড়ো-বড়ো নগরীর বুকভরা ব্যথা ;
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সঙ্কল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।
তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুষ্কতার জল, সূর্য মানে আলো ;
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।

সবিতা

সবিতা, মানুষজনু আমরা পেয়েছি
মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে :
ভূমধ্যসাগর ঘিরে যেই সব জাতি,
তাহাদের সাথে
সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন ;
মনে পড়ে নিবিড় মেরুন আলো, মুক্তার শিকারী,
রেশম, মদের সার্থবাহ,
দুধের মতন শাদা নারী।

অনন্ত রৌদ্রের থেকে তারা
শাশ্বত রাত্রির দিকে তবে
সহসা বিকেলবেলা শেষ হয়ে গেলে
চলে যেত কেমন নীরবে।
চারিদিকে ছায়া ঘুম সপ্তর্ষি নক্ষত্র ;
মধ্যযুগের অবসান
ছিন্ন করে দিতে গিয়ে ইওরোপ গ্রীস
হতেছে উজ্জ্বল খৃষ্টান।

তবুও অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা—
সিন্ধুর রাত্রির জল জানে—
আধেক যেতাম নব পৃথিবীর দিকে ;
কেমন অনন্যোপায় হাওয়ার আহ্বানে
আমরা অকূল হয়ে উঠে
মানুষকে মানুষের প্রয়াসকে শ্রদ্ধা করা হবে
জেনে তবু পৃথিবীর মৃত সভ্যতায়
যেতাম তো সাগরের স্নিগ্ধ কলরবে।

এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে :
কী এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন।

তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন ;
তোমার মুখের রেখা আজও
মৃত কত পৌত্তলিক খৃষ্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন ;
কত কাছে-তবু কত দূর।

শারদীয় ১৩৫৪

BANGLADARSHAN.COM

সুচেতনা

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।
এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে ;
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

আজকে অনেক রুঢ় রৌদ্রে ঘুরে প্রাণ
পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো
ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু,
দেখেছি আমারই হাতে হয়তো নিহত
ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে ;
পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

কেবলই জাহাজ এসে আমাদের বন্দরের রোদে
দেখেছি ফসল নিয়ে উপনীত হয় ;
সেই শস্য অগণন মানুষের শব ;
শব থেকে উৎসারিত স্বর্ণের বিস্ময়
আমাদের পিতা বুদ্ধ কনফুশিয়সের মতো আমাদেরও প্রাণ
মূক করে রাখে ; তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ;
এ বাতাস কী পরম সূর্যকরোজ্জ্বল ;—
প্রায় তত দূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অস্তিম প্রভাতে।

মাটি-পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হত অনুভব করে ;
এসে যে গভীরতর লাভ হল সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ;
দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলই অনন্ত সুযোদয়।

BANGLADARSHAN.COM

অস্থান প্রান্তরে

‘জানি আমি তোমার দু-চোখ আজ আমাকে খোঁজে না আর, পৃথিবীর ‘পরে-’
বলে চুপে থাকলাম, কেবলই অশথপাতা পড়ে আছে ঘাসের ভিতরে
শুকনো মিয়োনো ছেঁড়া-অস্থান এসেছে আজ পৃথিবীর বনে :
সে সবে চের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু ; বললে সে, ‘ঘাসের ওপরে সব বিছানা পাতার
মুখে এই নিস্তরতা কেমন যে-সন্ধ্যার আবছা অস্পষ্ট জগতে
হাঁটলাম, চিল উড়ে চলে গেছে-কুয়াশার প্রান্তরের পথে
দু-একটা সজারুর আসা-যাওয়া ; উচ্ছল কলার ঝাড়ে উড়ে চুপে সন্ধ্যার বাতাসে
লক্ষ্মীপেঁচা হিজলের ফাঁক দিয়ে বাবলার আঁধার গলিতে নেমে আসে ;
আমাদের জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি আজও যেন লেগে আছে বহতা পাখায়
ঐ সব পাখিদের ; ঐ সব দূর-দূর ধানক্ষেতে, ছাতকুড়োমাখা ক্লান্ত জামের শাখায় ;
নীলচে ঘাসের ফুলে ফড়িঙের হৃদয়ের মতো নীরবতা
ছড়িয়ে রয়েছে এই প্রান্তরের বুকে আজ...হেঁটে চলি...আজ কোনো পথে
নেই আর আমাদের ; মাঠের কিনারে চের ঝরা ঝাউফল
পড়ে আছে ; শান্ত হাত, চোখে তার বিকেলের মতন অতল
কিছু আছে ; খড়কুটো উড়ে এসে লেগে আছে শাড়ির ভিতরে,
সজনে পাতার গুঁড়ি চুলে বেধে গিয়ে নড়ে-চড়ে ;
পতঙ্গ পালক জল-চারিদিকে সূর্যের উজ্জ্বলতা নাশ ;
আলোয়ার মতো ঐ ধানগুলো নড়ে শূন্যে কী রকম অবাধ আকাশ
হয়ে যায় ; সময়ও অপার-তাকে প্রেম আশা চেতনার কণা
ধরে আছে বলে সে-ও সনাতন ;-কিন্তু এই ব্যর্থ ধারণা
সরিয়ে মেয়েটি তার আঁচলের চোরকাঁটা বেছে
প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে সরে গেছে
যেই স্পষ্ট নির্লিপ্তিতে-তাই-ই ঠিক-ওখানে স্নিগ্ধ হয় সব।
অপ্রেমে বা প্রেমে নয়-নিখিলের বৃক্ষ নিজ বিকাশে নীরব।

পথ হাঁটা

কী এক ইশারা যেন মনে রেখে একা-একা শহরের পথ থেকে পথে
অনেক হেঁটেছি আমি ; অনেক দেখেছি আমি ট্রাম-বাস সব ঠিক চলে ;
তারপর পথ ছেড়ে শান্ত হয়ে চলে যায় তাহাদের ঘুমের জগতে।

সারারাত গ্যাসলাইট আপনার কাজ বুঝে ভালো করে জ্বলে।
কেউ ভুল করেনাকো-ইট বাড়ি সাইনবোর্ড জানালা কপাট ছাদ সব
চুপ হয়ে ঘুমাবার প্রয়োজন বোধ করে আকাশের তলে।

একা-একা পথ হেঁটে এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে করেছি অনুভব ;
তখন অনেক রাত-তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা
নির্জনে ঘিরেছে এসে ;-মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব

আর কিছু দেখেছি কি : একরাশ তারা-আর-মনুমেন্ট-ভরা কলকাতা ?
চোখ নিচে নেমে যায়-চুরুট নীরবে জ্বলে-বাতাসে অনেক ধুলো খড় ;
চোখ বুজে একপাশে সরে যাই-গাছ থেকে অনেক বাদামি জীর্ণ পাতা
উড়ে গেছে ; বেবিলনে একা-একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
কেন যেন ; আজও আমি জানিনাকো হাজার-হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

BANGLADARSHAN.COM

আবহমান

পৃথিবী এখন ক্রমে হতেছে নিরুন্ম।
সকলেরই চোখ ক্রমে বিজড়িত হয়ে যেন আসে ;
যদিও আকাশ সিন্ধু ভরে গেল অগ্নির উল্লাসে ;
যেমন যখন বিকেলবেলা কাটা হয় ক্ষেতের গোধূম
চিলের কান্নার মতো শব্দ করে মেঠো হুঁদুরের ভিড় ফসলের ঘুম
গাঢ় করে দিয়ে যায়।—এইবার কুয়াশায় যাত্রা সকলের।
সমুদ্রের রোল থেকে একটি আবেগ নিয়ে কেউ
নদীর তরঙ্গে—ক্রমে—তুষারের স্তূপে তার ঢেউ।
একবার টের পাবে—দ্বিতীয়বারের
সময় আসার আগে নিজেকেই পাবে না সে টের।

এইখানে সময়কে যতদূর দেখা যায় চোখে
নির্জন ক্ষেতের দিকে চেয়ে দেখি দাঁড়ায়েছে অভিভূত চাষা ;
এখনও চালাতে আছে পৃথিবীর প্রথম তামাশা
সকল সময় পান করে ফেলে জলের মতন এক ঢোকে ;
অঘ্রানের বিকেলের কমলা আলোকে
নিড়োনো ক্ষেতের কাজ করে যায় ধীরে ;
একটি পাখির মতো ডিনামাইটের 'পরে বসে।
পৃথিবীর মহত্তর অভিজ্ঞতা নিজের মনের মুদ্রাদোষে
নষ্ট হয়ে খসে যায় চারিদিকে আমিষ তিমিরে ;
সোনালি সূর্যের সাথে মিশে গিয়ে মানুষটা আছে পিছু ফিরে।
ভোরের স্ফটিক রৌদ্রে নগরী মলিন হয়ে আসে।
মানুষের উৎসাহের কাছ থেকে শুরু হল মানুষের বৃত্তি আদায়।
যদি কেউ কানাকড়ি দিতে পারে বুকুর উপরে হাত রেখে
তবে সে প্রেতের মতো ভেসে গিয়ে সিংহদরজায়
আঘাত হানিতে গিয়ে মিশে যায় অন্ধকার বিশ্বের মতন।
অভিভূত হয়ে আছে—চেয়ে দেখে—বেদনার নিজের নিয়ম।
নেউল-ধূসর নদী আপনার কাজ বুঝে প্রবাহিত হয় ;
জলপাই-অরণ্যের ওই পারে পাহাড়ের মেধাবী নীলিমা ;

ওই দিকে সৃষ্টি যেন উষ্ণ স্থির প্রেমের বিষয় ;
প্রিয়ের হাতের মতো লেগে আছে ঘড়ির সময় ভুলে গিয়ে
আকাশের প্রসারিত হাতের ভিতরে।

সেই আদি অরণির যুগ থেকে শুরু করে আজ
অনেক মনীষা, প্রেমে, নিমীল ফসলরাশি ঘরে
এসে গেছে মানুষের বেদনা ও সংবেদনাময়।
পৃথিবীর রাজপথে—রক্তপথে—অন্ধকার অববাহিকায়
এখনও মানুষ তবু খোঁড়া ঠ্যাঙে তৈমুরের মতো বার হয়।
তাহার পায়ের নিচে তৃণের নিকটে তৃণ মূক অপেক্ষায় ;
তাহার মাথার 'পরে সূর্য, স্বাতী, সরমার ভিড় ;
এদের নৃত্যের রোলে অবহিত হয়ে থেকে ক্রমে একদিন
কবে তার ক্ষুদ্র হেমন্তের বেলা হবে নিসর্গের চেয়েও প্রবীণ ?

চেয়েছে মাটির দিকে—ভূগর্ভে তেলের দিকে
সমস্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অবিরল যারা,
মাথার উপরে চেয়ে দেখেছে এবার ;
দূরবীনে কিমাকার সিংহের সাড়া
পাওয়া যায় শরতের নির্মেঘ রাতে।
বুকের উপরে হাত রেখে দেয় তারা।
যদিও গিয়েছে ঢের ক্যারাভান মরে।
মশালের কেরোসিনে মানুষেরা অনেক পাহারা
দিয়ে গেছে তেল, সোনা, কয়লা ও রমণীকে চেয়ে ;
চিরদিন এই সব হৃদয় ও রুধিরের ধারা।
মাটিও আশ্চর্য সত্য। ডান হাত অন্ধকারে ফেলে
নক্ষত্রও প্রামাণিক ; পরলোক রেখেছে সে জেলে ;
অনৃত সে আমাদের মৃত্যুকে ছাড়া।

মোমের আলোয় আজ গ্রন্থের কাছে বসে—অথবা ভোরের বেলা নদীর ভিতরে
আমরা যতটা দূর চলে যাই—চেয়ে দেখি আরও—কিছু আছে তারপরে।
অনির্দিষ্ট আকাশের পানে উড়ে হরিয়াল আমারও বিবরে
ছায়া ফেলে। ঘুরোনো সিঁড়ির পথ বেয়ে যারা উঠে যায় ধবল মিনারে,
কিংবা যারা ঘুমন্তের মতো জেগে পায়চারি করে সিংহদ্বারে,

অথবা যে সব খাম সমীচীন মিস্ত্রির হাত থেকে উঠে গেছে বিদ্যুতের তারে
তাহারা ছবির মতো পরিতৃপ্ত বিবেকের রেখায় রয়েছে অনিমেষ।
হয়তো অনেক এগিয়ে তারা দেখে গেছে মানুষের পরম আয়ুর পারে শেষ
জলের রঙের মতো স্বচ্ছ রোদে একটিও বোলতার নেই অবলেশ।

তাই তারা লোষ্ট্রের মতন স্তব্ধ। আমাদেরও জীবনের লিপ্ত অভিধানে
বর্জাইস অক্ষরে লেখা আছে অন্ধকার দলিলের মানে।
সৃষ্টির ভিতরে তবু কিছুই সুদীর্ঘতম নয়—এই জ্ঞানে
লোকসানি বাজারের বাজের আতাফল মারীণ্ডিকার মতো পেকে
নিজের বীজের তরে জোর করে সূর্যকে নিয়ে আসে ডেকে।

একটি আলোক নিয়ে বসে থাকা চিরদিন ;
নদীর জলের মতো স্বচ্ছ এক প্রত্যাশাকে নিয়ে ;
সে সবার দিন শেষ হয়ে গেছে
এখন সৃষ্টির মনে—অথবা মনীষীদের প্রাণের ভিতরে।
সৃষ্টি আমাদের শত শতাব্দীর সাথে ওঠে বেড়ে।

একদিন ছিল যাহা অরণ্যের রোদে—বালুচরে,
সে আজ নিজেকে চেনে মানুষের হৃদয়ের প্রতিভাকে নেড়ে।
আমরা জটিল ঢের হয়ে গেছি—বহুদিন পুরাতন গ্রহে বেঁচে থেকে।
যদি কেউ বলে এসে : ‘এই সেই নারী,
একে তুমি চেয়েছিলে ; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ—’
তবুও দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায় গিয়েছে কার কাজ ?

আমাদের মৃত্যু নেই আজ আর,
যদিও অনেক মৃত্যুপরম্পরা ছিল ইতিহাসে ;
বিস্তৃত প্রাসাদে তারা দেয়ালের অবলম্ব ছবি ;
নানারূপ ক্ষতি ক্ষয়ে নানা দিকে মরে গেছি—মনে পড়ে বটে
এইসব ছবি দেখে ; বন্দীর মতন তবু নিস্তব্ধ পটে
নেই কোনো দেবদত্ত, উদয়ন, চিত্রসেনী স্থাণু।
এক দরজায় ঢুকে বহিষ্কৃত হয়ে গেছে অন্য-এক দুয়ারের দিকে
অমেয় আলোয় হেঁটে তারা সব।
(আমাদের পূর্বপুরুষেরা কোন্ বাতাসের শব্দ শুনেছিল
তারপর হয়েছিল পাথরের মতন নীরব ?)

আমাদের মণিবন্ধে সময়ের ঘড়ি
কাচের গেলাসে জলে উজ্জ্বল শফরী ;
সমুদ্রের দিবারৌদ্রে আরক্তিম হাঙরের মতো ;
তারপর অন্য গ্রহ-নক্ষত্রেরা আমাদের ঘড়ির ভিতরে
যা হয়েছে, যা হতেছে, অথবা যা হবে সব একসাথে প্রচারিতা করে।
সৃষ্টির নাড়ীর 'পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়
অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ ;
তবু তারা করেনাকো পরস্পরের ঋনশোধ।

শারদীয় ১৩৪৭

BANGLADARSHAN.COM

ভিখিরি

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি বাদুড়বাগানে,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরও—
তবে আমি হেঁটে চলে যাব মানে-মানে।
—বলে সে বাড়ায়ে দিল অন্ধকারে হাত।

আগাগোড়া শরীরটা নিয়ে এক কানা যেন বুনে যেতে চেয়েছিল তাঁত ;
তবুও তা নুলো শাঁখারির হাতে হয়েছে করাত।

একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি মাঠকোটা ঘুরে,
একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি পাথুরিয়াঘাটা,
একটি পয়সা যদি পাওয়া যায় আরও—
তা হলে টেকির চাল হবে কলে ছাঁটা।
—বলে সে বাড়ায়ে দিল গ্যাসলাইটে মুখ।

ভিড়ের ভিতরে তবু—হারিসন রোডে—আরও গভীর অসুখ
এক পৃথিবীর ভুল ; ভিখিরির ভুলে : এক পৃথিবীর ভুলচুক।

তোমাকে

একদিন মনে হত জলের মতন তুমি।
সকালবেলার রোদে তোমার মুখের থেকে বিভা—
অথবা দুপুরবেলা—বিকেলের আসন্ন আলোয়—
চেয়ে আছে—চলে যায়—জলের প্রতিভা।

মনে হত তীরের উপরে বসে থেকে।
আবিষ্ট পুকুর থেকে সিঙাড়ার ফল
কেউ-কেউ তুলে নিয়ে চলে গেলে—নিচে
তোমার মুখের মতন অবিকল

নির্জন জলের রঙ তাকায়ে রয়েছে ;
স্নানান্তরিত হয়ে দিবসের আলোর ভিতরে
নিজের মুখের ঠাণ্ডা জলরেখা নিয়ে
পুনরায় শ্যাম পরগাছা সৃষ্টি করে ;
এক পৃথিবীর রক্ত নিপতিত হয়ে গেছে জেনে
এক পৃথিবীর আলো সব দিকে নিভে যায় বলে
রঙিন সাপকে তার বুকের ভিতরে টেনে নেয় :
অপরাহে আকাশের রঙ ফিকে হলে।

তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস ;
তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত :
নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস।